আমাতে, কতক তোমাতে, কতক মৎস্য কুম্ভীরে, ইহা স্বীকার্য্য নহে। আমিই চিন্ময় একমাত্র সদ্বস্তু, আর সমস্তই আমার কল্পনা। আমার চৈতন্যের প্রমাণ অনাবশ্যক, মদ্বহির্ভূত চৈতন্যের প্রমাণ নাই। এই চৈতন্যরূপী 'অহম্', প্রাকৃত ভাষায় 'আমি', সংস্কৃত ভাষায় 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম', ইহাই এক এব অদ্বিতীয় সদ্বস্তু। ইহাই বোধ করি বেদান্তের তাৎপর্য্য।

এই এক এব সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সত্য পদার্থ—তথাস্তু। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ—mind-stuff—তথাস্তু। ইহা আনন্দ—তাই কি? কেহ কেহ ভ্রূকুটী করিবেন;—বলিবেন জানি না, উহা অজ্ঞেয়, অনির্দ্দেশ্য। স্পেন্সারের ক ও খ'এর খ'কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট ক। বৌদ্ধ বলেন উহা শূন্য। হিউম ও হক্সলী হয়ত বলিবেন, সদ্বস্তুর জন্য এত মাথাব্যথা কেন? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার আবশ্যকতা কি? চিদ্বস্তু, সন্দেহ নাই? কিন্তু চিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। নৌমেননের মরীচিকায় প্রতারিত হইও না।

সুখ না দুঃখ ?

মোটামুটি বলিতে গেলে মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করিবার জন্যই সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায়, বা যে যা' বুঝে, তাহার জন্য, অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতর প্রাণীর পক্ষে সুখের চেষ্টাই জীবনপ্রণালী; এবং স্থূল হিসাবে সুখান্বেষণ চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি ও জৈবিক প্রবাহ। এস্থলে সুখ কি, সুখের অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতর্ক তোলার প্রয়োজন

নাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে, সে তাহাই লক্ষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করে। তাহার উদ্দেশ্য, তাহার লক্ষীভূত পদার্থ, অন্যের আদর্শোপযোগী হউক আর নাই হউক, সেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র চেষ্টার সমবেত ফলে সৃষ্টি চলিতেছে; উন্নতিই বল আর অধোগতিই বল, জীবজগতে বা নরসমাজে অভিব্যক্তি তাহার ফলেই চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। অভিব্যক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিব্যক্তিপ্রণালী স্থূল কথায় এই।

যদিও আবহমানকাল ধরিয়া মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই নাম জীবনপ্রয়াস, কিন্তু জীবনে সুখের ভাগ বেশী কি দুঃখের ভাগ বেশী, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই কথা-টার মীমাংসা লইয়া দলাদলি চলিতেছে। এক পক্ষের মতে জীবনে সুখের মাত্রা অবশ্য অধিক; অন্যপক্ষ বলেন, দুঃখের পরিমাণ সুখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে। হইতে পারে, প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিক মাত্রায় পাইয়াছেন; তাঁহারা সুস্থচোখে সকলই সুন্দর দেখেন, এবং কুৎসিত হইতে স্বভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ নিজ জীবনে তাদৃশ সৌভাগ্য-শালী নহেন; তাঁহাদের রুগ্নচক্ষু সুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং নৈরাশ্যের দুর্ব্বলতায় শিথিল পদদ্বয় দুঃখের পঙ্ক হইতে উঠিয়া সহজলভ্য সুখের শুষ্ক বর্ত্মে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতামত নিজ জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়া মাত্র; জগতে সুখদুঃখের তারতম্যনির্ণয়ে ইঁহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্ পক্ষে গুরুতর, তাহা স্থির করাই প্রধান সমস্যা; নিকৃতির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছে, তাহা ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মীমাংসা বাকি থাকিত না।

কেননা, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন প্রকৃতিগত চশমা চোখে না দিয়া থাকিতে পারেন না ; কাজেই কেহ বলেন, এদিক্ ভারী, কেহ বলেন ওদিক্।

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই ;—জীবনে সুখ বেশী, জীবনের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। জীবনে সুখ না থাকিলে, অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন ? মানুষ যে বাঁচিতে চায়,—অবশ্য দুই চারিটা আত্মঘাতীকে বাদ দিয়া—ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে। দুঃখের ভাগ বেশী হইলে, দড়ি কলসী যোগান এতদিন 'বিরাট' ব্যাপার হইত ; সংসার এতদিন জীবহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত। আধিব্যাধি, মরণ-যাতনা, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, তাহার উপর মুখোসপরা ধর্ম্মের জয়জয়কার ও প্রণয়ে কৃত্রিমতা, এসব নাই এমন নহে ; তবে স্নেহ, দয়া, ভক্তি, মমতা, সারল্য, প্রেম ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে। এই সকলও জগতে বর্ত্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়াই মানুষ আহারনিদ্রাসম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও নিতরাং ব্যাপৃত ; নতুবা অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি ব্যাপারটা এতদিন লোপ পাইত, এবং ডারুইন সাহেবকেও অভি-ব্যক্তিবাদের সমর্থনের জন্য প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর।

আজিকালি যাঁহারা নীতিশাস্ত্র নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহারা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না ;—কেন না, দুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বর্দ্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য ;

দুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি ঘটিত না, সুতরাং দুঃখ আছে বৈ কি। নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের প্রবাহ সেই মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা দুঃখপ্রদ বা মোটের উপর দুঃখপ্রদ, তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু "সুখ" শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবের উচু অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। সুখ শব্দে কেবলই যে নিম্ন পর্য্যায়ের ঐন্দ্রিয়িক সুখই বুঝিতে হইবে, এমন আইন নাই। সুখ কি? না যাহাতে জীবন বর্দ্ধন করে; এবং জীবনবর্দ্ধনের ন্যায় মহান্ উদ্দেশ্য প্রকৃতির নিকট আর কি আছে? এইরূপে সুখ শব্দটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা বড় থাকে না। যাহা হউক, মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি হইতেছে যদি ধরা যায়, তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে; কখনও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্ব্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক; নহিলে লোকে জীবনবর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইত। ধর্ম্মনীতি উলটাইয়া যাইত। স্নেহমমতা পাপের পর্য্যায়ে ও চুরিডাকাতি ধর্ম্মের পর্য্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন অবশ্যই মানুষ মোটের উপর সুখী।

ডারুইনের লিখিত পুঁথি কয়খানা জগতের দৃশ্যপটটাকে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শান্তি, প্রীতি ও মাধুর্য্য দেখা যাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা, স্বার্থ, শোণিততৃষা ও নির্দ্দয় দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেটাকে ঋষিদের তপোবনের মত 'শান্তরসাস্পদ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি-ভ্রম! এই নির্ম্মম দ্বন্দ্ব আবার মনুষ্যসমাজেরও উন্নতির অনেকটা মূল,

একথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি অঙ্কের অভিনয় এখনও যে শীঘ্র থামিবে এরূপ ভরসা বড়ই অল্প। কিন্তু যাঁহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে নূতন নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, হবার্ট স্পেন্সর ইহার প্রধান প্রচারক; এবং হবার্ট স্পেন্সর ডারুইন-তত্ত্বের একজন "পাণ্ডা"।

ডারুইনের প্রদর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের সুখময়ত্বে বিশ্বাস করা বড়ই অসংসাহসিক ব্যাপার হয়; কেন না, হিংসা ও রক্তপাতই যেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আবার সুখ কি? ঘাতকের কিয়ৎপরিমাণে আপন মনের মত সুখ বা তৃপ্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু সেও ক্ষণিকমাত্র; কেন না, জঠরজ্বালারূপ সদাতন মহাদুঃখনিবারণের জন্যই এই হত্যাব্যবসায়; এবং আহারসম্পাদনের পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালার পুনরাবির্ভাব। আর যে হন্যমান, তাহার যে পরোপকার-বৃত্তি সে সময়ে বিশেষ প্রবল হয়, এবং তজ্জন্য সে পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, ডারুইন-তত্ত্বের অন্যতর প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ আলফ্রেড ওয়ালাস্ ইহারও উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালাস এ হেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, হিংসা আছে, কিন্তু ক্লেশ নাই। হত্যাকার্য্যের দর্শক যেমন ভয় পান, যাহার উপর কার্য্যটা নিষ্পন্ন হইতেছে, সে ততটা ভয় পায় না। দয়াশীলা প্রকৃতির এমনই সুচারু নিয়ম যে, হন্যমান জীবের অনুভূতির তীব্রতা থাকে না, এমন কি, বোধশক্তি হয়ত হননকালে লোপ পায়। প্রহার দেখা, শুনা বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে কোন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন

কি না সন্দেহ। তবে ওয়ালাসের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়ালাসের প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে, বলা যায় না। প্রহার ভোগে যেন ক্লেশ খুব কম হইল, বা না হইল; তবে প্রহারদর্শনও ত নিত্য ঘটনা। এবং প্রহারদর্শনে যদি দুঃখ হয় ও প্রহারের নিবারণও যদি অসাধ্য হয়, তবে জগতে দুঃখের লোপ হইল কই? আবার দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায়; কেন না, দুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখও আছে। একের অস্তিত্ব অন্যের সাপেক্ষ। আবার দুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত অভিব্যক্তি। কাজে দুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্ত্তমান জীবনদ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিবাদই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ওয়ালাসও যে স্বপ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের এই মূলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে প্রকৃতির সমুদায় বিধানই দুঃখ লঘূকরণের অভিমুখী, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁহারা জীবনকে দুঃখময় বলেন, তাঁহারা ওপক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাধিক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে চান। কই খুঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য; দুঃখের মত সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই। দারিদ্র্যকে দুঃখ বল, সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; ধনী কয়টা? অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায়? আবার অধর্ম্মে দুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম্ম বেশী না অধর্ম্ম বেশী? ধার্ম্মিক যেখানে দুইটা, অধর্ম্ম সেখানে দুশ'টা; আবার ধার্ম্মিক দুইটার ধার্ম্মিকত্ব প্রমাণসাপেক্ষ, অধার্ম্মিক দুশ'টার অধার্ম্মিকতায় সন্দেহ নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবন বা জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সেত কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখমোচনের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হায়, অধিকাংশ স্থলে প্রয়াস কি কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র নহে? আবার মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা

লইয়াই জীবন ও জীবনের সমুদায় কার্য্য ; বুদ্ধি, কি চিন্তা, কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তিত ইচ্ছারই ভরণপোষণ ও পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত। সেই ইচ্ছার অর্থ কি ? না, বর্ত্তমান অভাবের, বর্ত্তমান ক্লেশের, দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে ইচ্ছা থাকিত না, জীবনের আবশ্যকতা থাকিত না। জীবনের সংজ্ঞাই যেখানে দুঃখময়তা হইল, দুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই জীবনের স্রোত হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণের নিষ্ফল আয়াসই জীবনের সমাপ্তি হইল, সেখানে জীবন দুঃখময়, কি সুখময়, তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেই খানে জীবনপ্রবাহও রুদ্ধ, অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা ; তবে নিষ্কৃতি হয় না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই ? সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা কি দেখা যায় ? ধর সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই ; দুঃখের তীব্রতা আছে। "সুখ যত স্থায়ী হয়, তত কমে ; দুঃখ যত থাকে, তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায় ; দুঃখকে সুখ হইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক, হিংসা, ঈর্ষ্যা, পরিতাপ সবই দুঃখময় ;—যৌবন, স্বাধীনতা, দুঃখের তাৎকালিক অভাব মাত্র ; ধন, মান, প্রণয়, সুখের আশা দেয়, কিন্তু আনে দুঃখ ; স্নেহ, দয়া, মমতা, ইহারাত অধিকাংশ দুঃখেরই মূল ;—জ্ঞান, ধর্ম্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়"। *

* Sidgwick's History of Ethics, P. 273.

যে জ্ঞানী, যে ধার্ম্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক। দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কাঠ পাথরের আবার দুঃখ কি ?

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। উন্নত কে ? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, সুতরাং ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর; নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখও অধিক। ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খায়; বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাউয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে; কার দুঃখ অধিক ?

মোটের উপর জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পূর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ফাঁদ এড়াইতে যাইয়া ফাঁদে পা দিতেছে; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না; তথাপি সে বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য। বুদ্ধিমান্ যে আত্মঘাতী। সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

বর্ত্তমান দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান শ্রেণী। সুখের আশা নাই; সভ্যতার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি দুঃখই বাড়াইবে; সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর; ইচ্ছা নিরোধ কর; তোমার জীবন, তৎসঙ্গে জাতীয় জীবন, শূন্যত্বে সমাহিত হউক। স্ফূর্ত্তিমান্ ইংরাজ যে মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায়; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্ম্মণিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না।

হিন্দুর মোক্ষ, বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ, এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্য্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, গরু দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও, বলিয়া যাঁহারা হোমানলে সোমরস ঢালিতেন, তাঁহাদের জীবনের প্রতি একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উপনিষদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবন। তার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে সেই একই কথা বলিয়াছে; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে; যিনি যখন বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা; ইচ্ছা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মোক্ষ লাভ করিবে। আধুনিক হিন্দুর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।

কবিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে পারে কাব্যে যাহা দেখি, তাহা কবির নিজ জীবনের অনুভবের প্রতিফলিত ছায়ামাত্র। কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন, বোধ হয় না। ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু যাঁহার নজরে পড়ে, শোকমূর্চ্ছিতা রতিকে যিনি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী দেখেন, তিনি যে মরণের ন্যায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্ বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া কেবল সৌন্দর্য্যদর্শনেই ব্যাপৃত থাকবেন, বিচিত্র নহে। রামায়ণ মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্ দুঃখ-সঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য-অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর; বৈরাগী হইওনা। শেক্ষপীয়রের কল্পিত পরী-রাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্ত্তিমত্তা দেখিয়া ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদ্গত

প্রফুল্ল স্ফূর্ত্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান্ টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখানেই শেক্ষপীয়র জীবনের রহস্যভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রণয়ের নৈরাশ্য, ধর্ম্মের বিড়ম্বনা ও জীবনের নিষ্ফলতায় উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধু-শোকার্ত্ত টেনিসন্ সৃষ্টিলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃত দেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা কখনও বা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা;—জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে ও খাটাইতেছে; কিন্তু তোমার বৃদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের জন্য যখন খেয়াল হইবে, নিষ্ঠুর ভাবে তোমায় বলিদান দিবে; তুমি যদি সুপুত্র হও, নিজের ভাবনা না ভাবিয়া প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান মনুষ্যের জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে, বুঝা যায় না।

মোট কথা পুরস্কারের আশা নাই; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না; প্রকৃতির এই উপদেশ।

মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।